রাণী ও অবিনাশ

অবিনাশের চেহারাটা এমনিতেই বেশ লম্বা, পা ফাঁক করে দাঁড়ালে অনেকটা বড় ছায়া পড়ে। কিন্তু এখন ছায়াটা একটু বেশী লম্বা—রাস্তা পেরিয়ে গেছে। সকাল সাড়ে দশটা বাজে, এখন সকলেরই ছায়া ছোটো-ছোটো, আর একটু বাদেই বিন্দু হয়ে যাবে—অথচ অবিনাশের ছায়াটা এমন বিচ্ছিরি লম্বা হল কি করে? রাত্তিরের দিকে পেছন থেকে আলো পড়লে ছায়া আপনি লম্বা হয়ে যায়। অনেক সময় অতিকায়, পঞ্চাশ ষাট ফুট পর্যন্ত, কিন্তু এখন সূর্য প্রায় মাথার ওপরে। অবিনাশ এদিক ওদিক তাকিয়ে আলাদা কোনো আলোর খোঁজ করলো—কিছুই নেই। তা হলে কি করে এতবড় ছায়া—পিচের রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের গ্যাস-পোস্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে তার মাথা। যাই হোক, ও নিয়ে আর অবিনাশ ব্যস্ত হলো না, বিজ্ঞানের আবিষ্কার-ফাবিষ্কার যত বেশী হচ্ছে—ততই অলৌকিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে—সে ভাবলে।

ভারী ভারী বাসগুলো তার ছায়ার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, অনেক ব্যস্ত মানুষ, রিক্সা—এমনকি ঠেলাগাড়িও চলে যাচ্ছে তার ছায়ার বা কাঁধের ছায়া মাড়িয়েই—যাই হোক, ব্যথা তো আর লাগছে না। তবু, অবিনাশ কয়েকবার সরে সরে দাঁড়ালো।

প্রজাপতিরঙা ছোটো ছোটো মেয়েরা স্কুল ছুটির পর বেরিয়ে আসছে—অবিনাশ দ্রুত চোখ চালিয়ে দিচ্ছে ওদের মধ্যে একবার করে—না, সর্দারণীরা এখনো বেরোয় নি। মেয়েদের সাইজ ক্রমশ বড় হচ্ছে। কচি কচি মেয়েদের পর এখন আসছে ডাঁসা মেয়েরা। ওয়ান-টু থেকে ক্লাস নাইন টেনের মেয়েদেরও ছুটি হয়ে গেল। এমনকি দু' একটা মেয়ের চেহারা দেখে এখন আর ছাত্রী কি মাস্টারণী বোঝা যায় না। তবে, চশমা-পরা কালো ঠোঁট দু'জন শিক্ষয়িত্রী না হয়ে যায় না। এমনও হতে পারে, রাণী আজ স্কুলে আসে নি। অথবা অন্য স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। কতদিন আগেকার শোনা খবরে এসেছে অবিনাশ। অথবা, রাণী হয়তো এখন আর চাকরি-টাকরি করে না। ওর স্বামীর এতদিনে যথেষ্ট পদোন্নতি হবার কথা। অফিসারদের বউদের কি আর মাস্টারী করলে মানায়! কিন্তু অবিনাশ শেষ পর্যন্ত দেখে যাবে। আর ক' মিনিট—এর পরই তো দুপুরের ছেলেদের স্কুল শুরু হয়ে যায়—সুতরাং আর বেশিক্ষণ নিশ্চিত ভিতরে বসে থাকবে না রাণী, যদি স্কুলে এসে থাকে।

প্রথমে যেমন জাহাজের মাস্তুলটুকু শুধু দেখা যায়, তেমনি দূরে অবিনাশ দেখতে পেল রঙীন প্যারাসোল, একটি সুডৌল হাত—মুখ না দেখতে পেলেও অবিনাশ চিনতে পেরেছে—ঐ হাঁটার ভঙ্গিটা তার খুব চেনা। হুঁ, এখনও বেশ শৌখিন আছে দেখছি, চমৎকার কায়দায় শাড়িটা পরেছে, ফুলহাতা মিডভিকটোরিয়ান ব্লাউজ, শান্তিনিকেতনের চটি। ইস্কুলে কাজ করলে তো এসব শখ বেশী দিন থাকে না। দিদিমণি দিদিমণি দেখাচ্ছে না যা হোক। তবে একটু মোটা হয়েছে ঠিকই।

অবিনাশ এগিয়ে গেল না। আর একটা সিগারেট ধরালো। আগে চোখাচোখি হোক না। আধ ঘণ্টার ওপর অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে, লোকেরা কি তাকে লক্ষ্য করছে? পাড়ার ছোঁড়ারা না আবার আওয়াজ দেয়। যাক্ গে। বাসে উঠে পড়বে নাতো টপ করে!

রাণী কিন্তু এদিকে তাকালো না। ছাতা না বন্ধ করে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো। সুতরাং অবিনাশই এগিয়ে গিয়ে ঘুরে কোনো কথা না বলে ওর সামনে দাঁড়ালো। বললো, চিনতে পারো?

—একি, তুমি? রাণী যেন খুব বেশী অবাক হয় নি। কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তাতেই অবিনাশের হাত চেপে ধরলো। এতদিনে মনে পড়লো অভাগিনীকে? একটু দয়ামায়া নেই শরীরে তোমার। মেয়েটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে একটা খবরও নিলে না।

—সত্যি, কতদিন পর তোমাকে দেখলুম, রাণী।

—পাঁচ বছর আট মাস।

অবিনাশ চমৎকৃত হয়ে গেল। রাণী কি প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস গুণেছে নাকি? না, টপ করে মুখে যা এলো বলে দিল। পরে মিলিয়ে দেখতে হবে। শেষ কবে দেখা হয়েছিল—সেই আলিপুরের ট্রামে না শশাঙ্কর বিয়ের সময়, না,—যাক্‌গে যাক্। রাণী ওর বাহু ছুঁয়ে আছে, অবিনাশেরও ইচ্ছে করলো রাণীর কাঁধে হাত রাখে—কিন্তু এইভাবে রাস্তায় ওর ছাত্রী-ছাত্র বোধহয় দেখে অবাক হবে। থাক্। তুমি কেমন আছো রাণী?

—ভালো নেই। তোমার জন্য সবসময় মন কেমন করে। বলেই রাণী হেসে ফেললো। তারপর হাসতে হাসতেই দুষ্টুমীর হাসি, গোপন করতে না পেরে, বললো, বিশ্বাস হলো না তো? সত্যিই কিন্তু হেসে ফেললো, কি হবে, তোমার জন্য খুব মন কেমন করে!

—থাক্ আর ইয়ার্কি করতে হবে না। শরীরটা নষ্ট করলে কেন? এরকম মোটা হতে হয়? কি সুন্দর ফিগার ছিল তোমার। এখন অত বড় বড়...

—এই, অসভ্যতা করো না, লোকে শুনতে পাবে। কি হবে আর এই পোড়া শরীরের দিকে নজর দিয়ে। আর তো আমার কেউ স্তুতি করার লোক নেই। আমি ঘরের বউ।

—কেন, স্কুলের সেক্রেটারী? তিনি বাড়িতে মাঝে মাঝে চা খেতে ডাকেন না? কিংবা, পাড়ার ছেলেরা স্বামীর বন্ধু, অথবা পাশের ফ্ল্যাটের কোনো সংগীতরসিক, তোমার স্তাবক নিশ্চিত এখনও অসংখ্য।

—না,—রাণী ছদ্মম্লান গলায় বললো, আবিসিনিয়ার রাজকুমার ছাড়া আমার রূপের প্রশংসা আর কেউ করে নি!

এটা একটা পুরোনো ঠাট্টা। রাণীর চেহারাটা ছেলেবেলায় ছিল ভারী সুন্দর, খুব কোঁকড়ানো চুল আর ফর্সা রঙের জন্য ওকে অনেকটা রাণী এলিজাবেথের (প্রথম) মতই দেখাতো। ওর নাম আসলে প্রতিমা, কিন্তু সবাই 'রাণী রাণী' বলেই ডাকে। কিন্তু অবিনাশকে কোনোক্রমেই রাজা বা রাজকুমার বলা যেতো না ছেলেবেলায়। ছেলেবেলা থেকেই ওর চেহারাটা চোয়াড়ে, কাঠখোট্টা, রং বেশ কালো। তাই রাণী ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো, 'আহা, সব রাজকুমারই কি সুন্দর হবে নাকি? আফ্রিকার রাজকুমাররা, যত বড় রাজার ছেলেই হোক না—কালো কুচ্ছিৎতো হবেই! তুমি আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার!'

রাণী জিজ্ঞেস করলো, এখন কি চাকরি-টাকরি করছো?

—কিচ্ছু না। বিদেশে গিয়েছিলুম, ফিরে এসে আবার বেকার!

—ফিরলে কেন?

—আমি বিদেশে গিয়েছিলুম, তুমি জানতে?

—জানতুম না? সব খবর রাখি। দেখা না হলে কি হয়। ফিরলে কেন এত তাড়াতাড়ি?

—তোমার জন্য মন কেমন করছিল!

দু' জনেই আবার হেসে উঠলো অনেকক্ষণ। রাণী বললো, জানো, আমার এখন সাড়ে তিনশো—চারশো টাকা রোজগার। আমাকে বিয়ে করলে এখন তোমাকে বসিয়ে খাওয়াতুম। কি, আমাকে বিয়ে না করার জন্য এখন তোমার অনুতাপ হয় না?

—মোটেই না। খুব বেঁচে গেছি। প্রথম প্রথম, তুমি যখন ঐ হুঁৎকোটাকে বিয়ে করলে, প্রথম দু'তিন মাস বিষম কষ্ট হয়েছিল। মনে হতো, অবিশ্বাসিনী, ছলনাময়ী নারী। বুক ফেটে যেত। মনে হোত, সব মেয়েই এই রকম। তারপর বুঝতে পারলুম, খুব বেঁচে গেছি! ওফ! বন্ধুবান্ধবদের তো দেখেছি—বিয়ে করে এক একজন লেধরুস্ হয়ে যাচ্ছে, কি রকম বোকা বোকা তেলতেলে মুখ হচ্ছে এক একজনের। আমি কত খোলা হাত পা আছি—যখন খুশী বাড়ি ফিরতে পারি, জামার তলায় ময়লা গেঞ্জি পরলে ক্ষতি নেই, পকেটে পয়সা থাকলো বা না থাকলো, যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারি!

—কি নিষ্ঠুর, বাবা। অন্তত মিথ্যে করেও তো বলতে পারতে আমার জন্য কষ্ট হয় তোমার।

—মিথ্যে কথা বলার কি আর বয়স আছে! বুড়ো হয়ে গেলুম প্রায়, আমার বয়েস বত্রিশ, তোমারও তো আটাশ! নাকি আরও বেশী, তখন বয়েস ভাঁড়িয়েছিলে!

—এখন সে-সন্দেহ হচ্ছে কেন?

—বাঃ, পাঁচ বছরে যদি কারুকে দশ বছরের বুড়ি হতে দেখি, তবে সন্দেহ হবে না!

—যাঃ মিথ্যে! মোটেই দশ বছর নয়! দু'বছর ভাঁড়িয়েছিলুম, এখন আমার তিরিশ। আর প্রেম করা—বাহাদুরি তো জানি, লাজুক কোথাকার—এখনও নিশ্চয়ই মেয়েদের গায়ে হাত দিতে হাত কাঁপে। আমিই তো তোমাকে প্রথম সিডিউস করেছিলুম। তাও কি ভয়—

—সেদিন আর নেই! বিদেশে অন্তত শ'খানেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি।

—ওসব বীরত্ব আমার কাছে দেখাতে হবে না। আমার চেয়ে আর কেউ বেশী চেনে না তোমাকে।

একটু থেমে রইলো দু'জনেই। অবিনাশ রাণীর সারা শরীরে চোখ ঘোরায়। রাণী প্যাশ-চোখে তা লক্ষ্য ক'রে হাসে।

—সত্যিই বুড়ি হয়ে গেলুম। ইস্কুলে যখন মাস্টারণী সেজে বসে থাকি গম্ভীর হয়ে, এক এক সময় কি রকম হাসি পায়। জীবন কাটিয়ে দেওয়া তা'হলে এত সহজ! কালকে জানো—একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। ক্লাস টেনের মেয়েরা একটা কাগজ গোপনে চালাচালি করছিল, আমি ধরে ফেললুম। প্রেমপত্র। একজন লিখেছে, বাকিরা সেটা কপি করে নিচ্ছে। খুব বকুনি দিলুম, আসলে কিন্তু মনে মনে খুক্ খুক্ হাসছিলুম। বেশ লিখেছে, আমারও কপি করে নিতে ইচ্ছে করছিল। এক জায়গায় কি লিখেছে জানো, 'তোমার জন্য আমার বুকের মধ্যে ব্যথা করে, যেন অসম্ভব জ্বর হয় আমার।'—কি রকম অসভ্য! আমাদের সময় আমরা লিখতুম 'হৃদয়', এখনকার মেয়েরা লেখে 'বুক'। একটু দুঃখও হল আমার, আর কেউ নেই যাকে আমি আজ আর প্রেমপত্র পাঠাতে পারি।

—কেন, আমার ঠিকানা জানতে না?

—ইস্! শখ্ কম নয়! জানো, চিঠিতে একটা রবীন্দ্রনাথের কোটেশান পর্যন্ত দেয় নি। তার বদলে কোন্ আধুনিক কবির। কি জানি, তোমারই হয়তো।

—কেন, আমার কবিতা চেনো না? পড়ো না বুঝি আজকাল?

—যা তা রাবিশ্ লিখছো তো এখন! কে পড়ে ওসব!

—তোমার ইস্কুলের দু'একটা কচি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও না!

—ফাজলামি করতে হবে না। বাড়ি যাই।

—রাণী, তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল।

—আর দরকারে কাজ নেই। ঢের বেলা হল, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আড্ডা দিলে আমার বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলবে কে?

—ও, এবার বুঝি রাগ হল।

—না রে, পাগ্‌লা, সত্যি বাড়ি যেতে হ'বে। এগারোটায় ঝি চলে যাবে—তারপর ছেলেটাকে ধরতে হ'বে না!

—দ্যাখ, খুকি, চালাকি করিস্ না। এতদিন পর দেখা হল, অমনি বাড়ি আর বাড়ি! আচ্ছা, ঠিক আছে, আমিও তোর সঙ্গে বাড়িতে যাই।

—অত খাতির নয়। আমার কত্তা ছুটি নিয়ে বাড়িতে আছে। দেবে গলা ধাক্কা।

—তবে চল্ কোনো চায়ের দোকানে বসি। সত্যি একটা খুব দরকারী কথা আছে, তোর সঙ্গে।

—আবার তুই-তুকারি শুরু করছিস!

—তুই-ই তো প্রথম আরম্ভ করলি। তোর ছেলের কি নাম রেখেছিস?

—তোর নামে নয়। ভাবছি অবিনাশ নাম দিয়ে একটা বাচ্চা কুকুর পুষবো, সব সময় বুকে জড়িয়ে থাকবো তাকে।

—রাণী তোকে খুব জরুরী একটা কথা বলতে এসেছিলুম!

—কোনো দরকার নেই।

—সত্যি, একটা বিশেষ কথা আছে।

—না, অবি, কেন এসেছিস এতদিন পর? কেন ভেঙে-চুরে দিতে এসেছিস? বেশ তো আছি সংসার পেতে, চাকরি করছি, স্বামী-পুত্র নিয়ে ছেলেবেলার পুতুল খেলার মতো বৌ-বৌ খেলছি। তুই চাস, সব টান্ মেরে ফেলে দিই আবার? কিন্তু তুই তো পাগল, তুই তো আমার পাশে থাকবি না জানি। কেন এসেছিস আমার সর্বনাশ করতে। তুই যা।

—না রে, আমি এসেছি মাত্র একদিনের জন্য। শুধু একদিন। চল্, কোথাও গিয়ে একটু বসে কথা বলি।

—উপায় নেই যে। সবাই ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করবে। এত দেরি করে তো কোনোদিন ফিরি না। ঐ বাস্‌টায় উঠি।

—একটু দাঁড়া। আচ্ছা মনে কর খুব ট্র্যাফিক-জ্যাম। বাসে ওঠার কোনোক্রমে উপায় নেই। তা হলে কি করতিস, দেরি তো হতেই।

—তা হলে হেঁটে যেতাম।

— আচ্ছা চল্, হেঁটেই যাই। এইটুকু সময়ে তোকে একটা কথা বলি। এখনো শীত যায় নি, রোদ্দুরের তাত নেই।

অবিনাশ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি যে রাণী ওর ছায়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুত, সূর্য এখন মাথার কাছে এসেছে। স্বাভাবিক এবং ছোটো হয়ে গেছে অবিনাশের ছায়া। অবিনাশ ঘুরে এসে রাণীর ছায়ার ওপরে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে বেশ আরাম পেল।

রাস্তার লোকজন অনেক কমে গেছে। কোথায় পরের বাড়ি জলের দরের মতো নিলাম হচ্ছে, অধিকাংশ লোক সেখানেই ছুটে যাচ্ছে সন্দেহ কি। দু'জনে দু'জনের ছায়া সরিয়ে হাঁটতে লাগলো।

রাণী ওর রঙিন ছাতাটা অল্প দোলাচ্ছে। অবিনাশ ওর সুন্দর কারুকাজ করা হাত-ব্যাগটা টেনে নিয়ে বললো, দেখি কি আছে? ঠোঁট উল্টে রাণী বললো, কিছুই নেই, কি আর থাকবে—বাড়ি থেকে ইস্কুল আর ইস্কুল থেকে বাড়ি যাই। ক'টা খুচরো পয়সা আছে।

—ভেবেছিলুম, কটা টাকা চুরি করবো।

—এক সময় তো অনেক চুরি করেছো বাপু।

—তা সত্যি। অনেক টাকা নিয়েছি তোর কাছ থেকে, রাণী।

—কেন আজ দেরি করিয়ে দিলি, এতক্ষণে কবে বাড়ি পৌঁছে যেতুম।

—সত্যিই তোর ইচ্ছে করছে না আমার সঙ্গে থাকতে? একসময় তো আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করতিস।

—ছেলেবেলায় ওরকম হয়। আগে তো বৃষ্টির জন্যও ছটফট করতুম! এখন বৃষ্টি পড়লে বিরক্ত লাগে।

অবিনাশ হঠাৎ গম্ভীর গলায় ডাকলো, রাণী!

রাণী তখুনি জল কুলকুচি করার মতো হেসে বললো, এবার বুঝি বোকা-বোকা প্রেমের কথা শুরু করবি? খবর্দার! এখন আর কচি খুকিটি নেই যে ভোলাতে পারবে!

—কবেই বা তোকে ভোলাতে পেরেছি। ছেলেবেলা থেকেই তো তুই পাকা একটি। প্রেমের কথা তো তুই-ই আমায় শিখিয়েছিস। তোর ওপরের ঠোঁটে পাতলা ঘাম জমেছে।

খুব ইচ্ছে করছে একটা চুমু খাই। এতক্ষণ কথা বলছি—অথচ একটাও চুমু খাই নি তোকে—এরকম আগে কখনও হয়েছে?

—তবে আর কি, রাস্তার মধ্যেই শুরু করো। হাজারটা ক্যামেরায় ছবি উঠুক্।

—ঐ জন্যই তো বলছিলুম কোথাও গিয়ে বসি।

—ইস্, কোথাও বসলেও যেন দিতাম আর কি! এখন থেকে কোথাও বসলে আমরা বসবো টেবিলের দু'পাশে।

—দেখিস চেষ্টা করে। তোর স্বামী যখন থাকবে না, দুপুরে একদিন বাড়িতে গিয়ে হাজির হবো।

—শাশুড়ি থাকে।

—থাকুক্। শাশুড়ি যেদিন গঙ্গায় স্নান করতে যাবে। আমি তক্কে তক্কে থাকবো।

—আমি দরজায় খিল দিয়ে থাকি। খুলবোনা। কেন খুলবো? তুই আমার কে?

—আমি জলের পাইপ বেয়ে উঠবো।

—কেন? তুই আমার কে?

—আমি তোর সর্বস্ব! তুই-ই তো বলতিস।

—ইস, কোথাকার সর্বস্ব রে! দেখি মুখখানা।

—তুই আমাকে একেবারে গ্রাহ্যই করিস না রাণী। আমি বিলেত ঘুরে এলুম হাজার হোক, আমি এখন একটা বিলেতফেরৎ।

—ওরকম বিলেতফেরৎ গন্ডায় গন্ডায় রাস্তায় ঘুরছে। তুই আমাকে এতদিন পর বিলেত দেখিয়ে ইম্প্রেস করতে এসেছিস! কি অধঃপতন তোর।

—রাস্তা থেকে একদিন জোর করে ধরে নিয়ে যাবো।

—চেষ্টা করে দেখিস। আমার গায়ে এখনও জোর আছে। তা ছাড়া এমন চেঁচাবো যে রাস্তার হাজারটা লোক এসে গাঁট্টা মেরে তোর মাথা ফাটিয়ে দেবে। বেশ হবে।

—ওসব লোকফোক আমাকে দেখাস নি। আমি অবিনাশ মিত্তির, ছেলেবেলা থেকেই গুন্ডা। একটা গাড়ি নিয়ে এসে চলতি রাস্তা থেকে তোকে টেনে তুলে নিয়ে যাবো।

—নিয়ে গিয়ে কি করবি?

—তোর পায়ের তলায় আমার মুখ ঘষবো।

রাণী হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো, এখুনি ঘষ্ না। এই যে দাঁড়িয়েছি। লোকে দেখুক, ক্ষতি নেই।

—তারপর তোর মুখও ঘষ্‌বি, আমার পায়?

—তার দরকার নেই। তোর ঐ কুচ্ছিৎ পা-জোড়া সব সময় রাখা আছে আমার বুকের মধ্যে।

—ও, তা হলে রাণী সান্যালও রোমান্টিক হতে জানে।

—সান্যাল নয়, রায়চৌধুরী এখন। পরস্ত্রী, মনে থাকে না বুঝি?

—বাঃ, পরস্ত্রী। আয় না রাণী, আমরা লুকিয়ে অবৈধ প্রেম করি। পরকীয়া প্রেম খুব ফাসক্লাস জিনিস।

—অবৈধ প্রেমই যদি করবো, তবে পুরোনো প্রেমিকের সঙ্গে কেন? আমি বুঝি নতুন একজন যোগাড় করতে পারি না?

—করেছিস নাকি এর মধ্যেই।

অবিনাশ রাণীর ছাতার একটা খোঁচা খেলো। ছাতার বাঁটের নিচে কাদা ছিল, অবিনাশের জামায় একটা গোল দাগ পড়লো। অবিনাশ যে সে দাগটা তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে আর একটা সিগারেট ধরালো—তাতেই খুশী ছড়িয়ে পড়লো রাণীর মুখে। ঈশ্বরের রাজত্বে কে কিসে খুশী হয় বোঝা যায় না। খুশী হয়ে রাণী বললো, আজকাল এত বেশী সিগারেট খাস কেন?

—তুই খাবি নাকি? আগে তো দু'একটা খেয়েছিস।

—হ্যাঁ, আমি পরপুরুষের সঙ্গে দিনের বেলায় সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রাস্তা দিয়ে

যাই। তা হলে আর আমার বাকি থাকে কি?

অবিনাশ একটু চুপ করে রইলো। তাকিয়ে দেখলো, ওদের ছায়া-টায়া কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমন বিশ্রী রাস্তা—কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই যে ছায়া পড়বে। নিছক রোদ্দুর, কোনো মানে নেই। সিগারেটে জোরে টান দিয়ে অবিনাশ বললো, সত্যি রাণী, আমরা অনেক দূর সরে গেছি—অথচ মাত্র ছ'সাত বছর। তোর মুখ থেকে 'পরপুরুষ' শব্দটা কি রকম অদ্ভুত শোনালো। যেন একটা বিদেশী শব্দ, যেন আমি একটা লৌহমানব, হাতে তলোয়ার নিয়ে তোর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ, মনে আছে, প্রত্যেকদিন সকালে—তুই যখন কলেজে যেতিস—

—থাক, পুরোনো কথা। আমি ভালো আছি অবিনাশ।

—আমিও খুব ভালো আছি। বিশ্বাস কর আমি কোনো দুঃখের কথা বলতে আসি নি।

রাস্তাটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে। ব্রীজের ওপর দিয়েও হাঁটা পথ আছে—নিচ দিয়েও আছে একটা সরু কাঠের রাস্তা। ওরা নিচ দিয়েই গেল। রেলিং ধরে দাঁড়ালো দু'জনে। নোংরা জলে অল্প স্রোত—অবিনাশ ওর সিগারেটের টুকরোটা ফেললো জলে, ব্রীজের নিচ দিয়ে ভেসে গেল। রাণী একেবারে জল ভালোবাসে না। অবিনাশ রাণীকেই পৃথিবীর একমাত্র মেয়ে জানে—জলের প্রতি যার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। যেমন রাণী এক্ষুণি ঐ জলে থুতু ফেললো।

রাণী বললো, এইবার শুনি কি দরকারটা? কি এমন দরকার আমার কাছে? ইস্, কত বেলা হয়ে গেল যে!

অবিনাশ জানতো রাণী এইবার ও কথা বলবেই। কিন্তু অবিনাশ দ্বিধা করছে। ঠিক কি রকমভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না। রাণী ওর দিকে দুটো সম্পূর্ণ চোখ তুলে বললো, কী?

—তোকে একটা কথা বলবো রাণী। তুই কিন্তু কিছু মনে করতে পারবি না। দূরে সরে গেলেও আমি তো তোর সেই অবিনাশই আছি।

—অত ভণিতার দরকার কি? কি চাই বল্ না।

—রাণী তোর বুকে সেই তিলটা আছে এখনও।

—হুঁ। ওর খুব একা একা লাগতো—তাই পাশে আর একটা নতুন তিল উঠেছে। যাক্ বাজে কথা—দরকারী কথাটা কি? কি চাইতে এসেছিস এতদিন পর?

—মুক্তি। এক কথায় বলতে গেলে—

—সে আবার কি? তুই-ও আমাকে মুক্তি দিয়েছিস আমিও তোকে দিয়েছি। বন্ধনটা আর কোথায়?

—সে রকম নয়। তুই আমার শরীরকে মুক্তি দিস নি। আমার মন ছাড়া পেয়ে গেছে কিন্তু—

রাণী অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। এই প্রথম অবিনাশের একটা কথা সে বুঝতে পারলো না। সেই জন্যই বোধ হয় অবিনাশের সারা মুখটা ও তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কোনো সংকেত নেই। অবিনাশ আবার বললো, বেশ থেমে থেমে ঠাণ্ডা গলায়—তোর কথা ভুলে যাবার পর—আমি বেশ কয়েকটা মেয়ের সংস্পর্শে এসেছি, আর, ইয়ে, মানে শুয়েছিও কয়েকজনের সঙ্গে—কোথাও তৃপ্তি পায় নি ঠিক। কেন পাই নি জানিস, সব সময় মনে হয়েছে, সত্যিকারের রহস্য যেন তোর শরীরেই লুকিয়ে আছে! তোর শরীর তো আমি জানি না।

—এবার বাড়ি যাই।

—না, না, শোন্, আমার পক্ষে খুব জরুরী কথা। আমার জীবনমরণ সমস্যা। আমার পুরো ছেলেবেলাটা কেটেছে তোর সঙ্গে—তোর কথা, হাসি, পাগলামি, শরীরের গন্ধ—অর্থাৎ যা কিছু ফেমিনিন্—তার স্বাদ আমি তোর কাছেই পেয়েছি। তোকে মনে হত একটা রহস্যের সিন্দুক। তোকে চুমো খেয়েছি, তোর জামার বোতাম খুলে বুকে মুখ চেপে ধরেছি—কি অসম্ভব উথাল পাথাল করতো তখন মাথার মধ্যে। ছেলেবেলায় সকলেরই

যা হয় আর কি। কিন্তু কোনোদিন তোর সঙ্গে শুই নি, সাহস পাই নি—ভাবতুম, অতখানি আমার সইবে না। ঐ অসম্ভব মাধুর্য আমাকে পাগল করে দেবে। আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাবো। এইসব আর কি। এখন দেখ, কত বদলে গেছি। চোয়ালের কাছে শক্ত দাগ পড়েছে, প্রেম-ফ্রেম ঘুচে গেছে মন থেকে, মদ খেতে শিখেছি খুব, মেয়েদের এখন অন্যভাবে চাই। অর্থাৎ মেয়েদের জানতে দিতে চাই না ওদের কাছ থেকে আমি কতখানি পাচ্ছি—খুব গোপনে, ওদের একদম বুঝতে না দিয়ে—আমার যেটুকু বিষম দরকার আমাকে নিতেই হবে। ওরা ভাববে বুঝি সাধারণ কাণ্ড-কারখানাই হচ্ছে—আসলে কাক যেমন কোকিলের ছানাকে পালন করে না জেনে—তেমনি মেয়েরা সম্পূর্ণ নিজেদের অজ্ঞাতসারে ওদের শরীরটা পুষে রাখে। কিছুই মানে বোঝে না শরীরের। আমি চাই ওরা না জেনে আমাকে একটা দুর্লভ জিনিস দিয়ে যাবে—। ওদের কোনোদিন বলবো না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, আমি সম্পূর্ণ পাচ্ছি না কখনো—সব সময় মনে হয় কিছু বাকি থেকে যাচ্ছে, একটি সম্পূর্ণ মেয়েকে কখনও পাই নি। তখনই তোর কথা মনে পড়ে—তোর কত-কিই তো আমি জানি—প্রায় গোটা জীবন—কিন্তু আমি তোর সম্পূর্ণ শরীর জানি না। তাই মনে হয়, সমস্ত রহস্য বা তৃপ্তি লেগে আছে তোর শরীরে। আমার জীবনের প্রথম নারীর কাছে। মানে, তুই কিছু মনে করছিস না তো—আমি অন্য মেয়ের সঙ্গে শুয়েছি এ কথা বললুম বলে। তুই-ও তো তোর স্বামীর সঙ্গে শুচ্ছিস—আমি কি আর কিছু মনে করছি। তুই নিশ্চয়ই আশা করিস নি—আমি সারা জীবন তোর বিরহে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবো।

—বয়ে গেছে আমার মনে করতে। যাক্, এ সব প্রলাপ শুনে আমার লাভ কি। আমি কি করবো?

—তুই বুঝতে পারছিস না রাণী? তোর উচিত আমাকে সাহায্য করা।

—কী রকম সাহায্য? আমার কাছে কি চাইছিস?

—একটি দিন।

—তার মানে?

—আমি তোর সঙ্গে একবার।

—তাতে কি লাভ হবে?

—আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই যে—আসলে তুই-ও খুব সাধারণ। অন্য মেয়েদেরই মতো। তোর শরীরেও কোনো আলাদা রহস্য নেই। তোকে হারিয়ে অন্য মেয়েকে পেলেও আমি আসলে একটি সম্পূর্ণ মেয়েকেই পাবো। তার বেশী আর কিছু পাবার নেই।

রাণী হঠাৎ চোখ দুটো খুব নিচু করলো। যেন ওর চোখ দুটো একেবারে ঢুকে গেল মুখমণ্ডলের মধ্যে। কপালের নিচে আর কিছু নেই, সাদা। সেইরকম ভাবেই বললো, অসভ্য, ইতর কোথাকার।

অবিনাশ বিষম অবাক হয়ে গেল। একটু দ্বিধা করে আলতোভাবে রাণীর কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, 'একি রাণী, তুই রাগ করছিস? আমি কিন্তু তোকে আঘাত করার জন্য বলি নি। আসলে, ভেবে দ্যাখ, আমরা দু'জনেই তো খুব সাধারণ। অন্যদেরই মতো। আমি শুধু নিঃসংশয় হতে চাই।

রাণী ফুঁসে উঠে বললো, না, আমি সাধারণ নই। আমি অসাধারণ!

—এটা তো ছেলেমানুষী! আমাদের এত বয়েস হল, এখন তো আমরা জানি। তোকে না পেলে আমি সবটুকু রহস্য পাবো না—একি সম্ভব নাকি!

—হ্যাঁ তাই। তুই যেখানেই যা—তৃপ্তি পাবি না। তোর প্রাণ একটা কৌটোয় পোরা ভ্রমরের মতো আমার কাছেই থাকবে। আমি তাকে মুক্তি দেবো না।

—ওসব কিছু না, রাণী। জীবন অন্য রকম। মানুষ বিষম ভুলে যেতে পারে। অনেক বদলে যেতে পারে। তুই একবার—

—তারপর আমার কি হবে? একজন মাত্র মানুষের কাছেও আমি অসাধারণ থাকবো না? অবি, তেকেও তো আমি সম্পূর্ণ পাই নি। একদিন পেয়ে যদি দেখি, তুইও সাধারণ, আমার স্বামীরই মতো—তা হলে আর আমার জীবনে কি রইলো? তোকে দেখলে এখনও

আমার বুক কেঁপে ওঠে। আজ প্রথম দেখে বিষম রক্ত ছলাৎ করে উঠলো। যদি দেখি,—তুইও তাহলে, আমার এই চাকরি-করা, স্বামীর সংসার, ছেলে মানুষ-করা—সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে না? আমার আর কি থাকবে তা হলে? আমার একটিও না-দেখা স্বপ্ন থাকবে না? একজনের কাছে অন্তত রাণী হয়ে থাকবো না? আমার জীবনে থাকবে না একজন অদেখা রাজকুমার? আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার! না, অবি, আমি সব কিছু জানতে চাই না। তুই দূর হয়ে যা।

—কিন্তু জানাই তো ভালো। নিশ্চিত হবার মতো এমন তৃপ্তি আর নেই। জীবন শেষ করার আগে জেনে যেতে হবে, জীবনে আমার কি কি প্রাপ্য ছিল। রহস্যের ভাবনায় কাটানো খুব কুচ্ছিৎ।

তুই আর আমার সামনে আসিস না। কোনোদিন না। সবচেয়ে ভালো হয় তুই যদি এখন মরে যাস্। তাহলে তোকে জেনে ফেলার কোনো ভয়ই আর থাকে না। তা হলেই তোকে আমি চিরকাল ভালোবাসতে পারবো।

—তুই ভুল করছিস। ওকে ভালোবাসা বলে না। কি দরকার ভালোবাসার। ভালোবাসা ছাড়াও জীবন খুব সুন্দর কেটে যেতে পারে। বড় কথা হল জানা। যদি তোকে—

—আমি তোকে আর সহ্য করতে পারছি না, অবিনাশ। তুই আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। তোর চোখে আমি ফের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। তোর জন্য আমার মায়া হয়।

পাশ দিয়ে যে সমস্ত লোক হেঁটে যাচ্ছে—তারা কিছুই বুঝতে পারছে না। এমন শান্তভাবে কথা বলছে রাণী! কিন্তু ওর মুখের একটি সামান্য রেখা দেখেও বোঝা যায়, ও দাঁড়িয়ে আছে ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো। অবিনাশ সত্যি বুঝতে পারছে না, হঠাৎ রাণী কেন এমন রাগ করলো। রাণীর ওপর ওর জোর ছিল কত। কত হুকুম করেছে একসময়। ওর কথায় রাণী একবার একহাত চুল কেটে ফেলেছিল নিজের। কলেজের মাইনের টাকা দিয়ে দিয়েছে অবিনাশকে। আজ একটা সামান্য কথায়—

অবিনাশ বললো, আমি ঝোঁকের মাথায় বলছি না, রাণী। অনেক ভেবে-চিন্তে এসেছি। আমরা দূরে সরে গেছি। কিন্তু আমাদের শারীরিক মুক্তি হয়নি। তোর সংসার আমি নষ্ট করতে চাই না মোটেই। আমাদের জীবন আলাদা হয়ে গেছে—আমরা দূরে দূরেই থাকবো। কিন্তু তার আগে—

হঠাৎ অবিনাশ দেখলো রাণী চলতে শুরু করেছে। পিছনে ফিরলো না, যেন ও একাই চলে যাবে। কি ভেবে অবিনাশ ওকে ডাকতে গিয়েও ডাকলো না। মনে মনে আন্তরিকভাবে বিদায় জানালো রাণীকে। ওখানে দাঁড়িয়েই ও আর একটা সিগারেট ধরালো। একা একা কিছু না ভেবে সিগারেট শেষ করলো। সত্যি সেইটুকু সময় ওর কিছু মনে পড়ল না, রাণীর কথা তো নয়ই, সম্পূর্ণ সাদা মন, ও নিচের ময়লা জলের স্রোত দেখলো। পকেটে হাত দিয়ে একবার খুচরো পয়সাগুলো গুণে দেখলো অনাবশ্যক। তারপর একটা ট্রামের টিকিট পাকিয়ে কান খুঁচতে খুঁচতে রাণীর জন্য হঠাৎ ও খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো, আমি কি রাণীকে অপমান করলুম? আমি তা মোটেই চাই নি। আসলে, যত বয়েস বাড়ছে, রাণী ততই ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে। আবার বছর পাঁচেক বাদে রাণীকে এই কথাটা বুঝিয়ে বলা যায় কিনা—অবিনাশ পরে ভেবে দেখবে।

রোডে ঘুরিয়ে আনবে? ওখানে গিয়ে যদি সব কথা মনে পড়ে—। নীপা দু'বার নিয়ে গিয়েছিল, দিনের বেলা অবশ্য। দেবকুমার সেখানেও কিছু বলেন নি নীপাকে, রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে রাস্তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পয়সা বিলিয়েছেন। নীপা কিছুই বুঝতে পারে না।

দেবকুমার এখন মাঝে মাঝে ডায়েরি লেখেন। কোনো কোনো দিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়, দেবকুমার বিছানা থেকে উঠে এক গ্লাস জল খান, একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবলেশ-হীন চোখে তাকিয়ে থাকেন বাইরের দিকে। নীপা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আর ঘুম আসতে চায় না দেবকুমারের, তিনি তখন ডায়েরি লিখতে বসেন—সে ডায়েরি নীপাকেও দেখান নি।

তাঁর ডায়েরির দুটি অংশ : "সেই লোকটির কোনো অসুখ ছিল না, এ কথা ভাবা ভুল। কম্বল গায়ে সেই লোকটি, তাঁর স্ত্রী, স্ত্রীর ভাই—ওরাও মানসিক রোগী। ওদের চোখের দৃষ্টির কথা ভাবলে এখন বুঝতে পারি—তা সুস্থ মানুষের দৃষ্টি নয়। সাধারণ ডাকাত ওরা নয়। ওদের অসুখ এখন এমন একটা জায়গায় এসেছে, সেখানে ওরা উপকারীকেও আঘাত করতে চায়। গোটা সমাজের অসুখ না সারলে, ওরাও সারবে না। ওরা সুস্থ হয়ে না উঠলে, সুস্থ হবার আশা নেই।"

আর একটি অংশ : "নীপার মনের অসুখ সম্পর্কে আগে আমার পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল না। এখন দেখছি আমার নিজেরই মনের অসুখ। হ্যাঁ, অসুখটা আমার মনের, মস্তিষ্কের নয়। আমার স্মৃতিভ্রংশ হলেও পুরোপুরি হয় নি কেন? আমি প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখি। সেদিন রাত্রে অজ্ঞান অবস্থায় এই স্বপ্নটা দেখেছিলাম—তারপর প্রায়ই দেখতে পাই।—কয়েকদিন অন্তর আমি দেখি, আমার হঠাৎ দারুণ অসুখ হয়েছে মাঝ রাত্রে, কিছুতেই কোনো ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না,—শহরের সব ডাক্তার এখন ছুটিতে—আমার গাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে, নীপা আর তিমির আমাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড় রাস্তার সামনে, একটা গাড়ি পেলে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। নীপার চোখে মুখে দারুণ ত্রাস, সে যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, তাড়াতে চাইছে প্রাণপণে। অবিকল সেই স্ত্রীলোকটির মতন, কিন্তু অভিনয় নয়। নীপা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বলেই মৃত্যু সম্পর্কে তার খাঁটি ভয়। আমার অসহ্য কষ্ট, কিন্তু আমার অসুখের জন্য নীপার এই ব্যাকুলতা দেখে একটু আরামও পাচ্ছি।...দূর থেকে একটা মোটরগাড়ি আসছে হেড লাইট জ্বালিয়ে, নীপা হাত তুলে ব্যাকুলভাবে চিৎকার করে গাড়িটা থামাতে চাইছে...স্বপ্নের মধ্যে এই জায়গাটায় আমি দারুণ ভয় পেয়ে যাই, ঘামে আমার শরীর ভিজে যায়, বুকের মধ্যে ধকধক করে আর বার বার মনে হয়, যদি গাড়িটা না থামে ; যদি গাড়িটা আমাদের না নিতে চায়? এই মাঝরাতে, যদি আমাদের ডাকাত মনে করে?"